পরিক্রমা

নিবেদন

ভগিনী নিবেদিতা নবজাগরণের ইতিহাসে এক বিস্মৃত অধ্যায়। কত সহজেই আমরা মহাপ্রাণদের ভুলে যাই। তাঁদের অনুস্মরণ করতে লাগে সর্বাঙ্গীণ উদ্যোগ, মনবুদ্ধির শুদ্ধতা ও একাগ্রতা। শুধু কথার ফুল স্রোতে ভাসালে চলে না, মনন ও স্মরণের জাল বুনলেও তার যথাযথ মর্যাদা দেওয়া যায় না। যেখানে চরিত্রের আগুন জ্বলছে, যেখানে আত্মনিবেদনের আহুতি অবিরত পড়েছে, যে-ছবি কালের স্রোতেও অমলিন মহিমায় উজ্জ্বলতর হচ্ছে, নৈঃশব্দ্য যেখানে কর্মের দুর্বার গতিতেও আত্মবিলীনতায় ডুবে গেছে—তার মূল্যায়ন যেমন কড়ি-ক্রান্তিতে হয় না, তেমনি শূন্যগর্ভ কথার প্রবাহেও নয়। জীবন থেকে জ্বলে ওঠা জীবনই কথা বলে ওঠে। ভগিনীর কণ্ঠে যখন নতুন যুগের নতুন মন্ত্র ছাত্রীদের সামনে বেজেছিল—ভারতের কন্যাগণ, তোমরা জপ করবে 'ভারতবর্ষ' 'ভারতবর্ষ' 'ভারতবর্ষ'—তখনই কি নবজাগ্রত ভারতের সঙ্গে অতীতের উজ্জ্বল ভারতের মিলনের সূচনা হয়নি?

পরাধীন ভারতের সব গ্লানি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, দাসসুলভ মনোভাব ও হীনম্মন্যতা ছিল তাঁর দৃষ্টির সামনে। স্বামীজী তাঁর মনে এসবের আড়ালে থাকা ভারতের চিরন্তন রূপটি এঁকে দিয়েছিলেন। সে-ভারত আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বল, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে আশ্চর্য অগ্রসর, তার প্রাচীনতম ইতিকথা বেদ-উপনিষদ, পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের পাতায় ধরা আছে। আর প্রকৃতির অঙ্গনে বিরাট, বিশাল হিমালয়, গঙ্গা-নর্মদা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-সিন্ধু-কাবেরীর কলধ্বনি, নদীবিধৌত উর্বর সুফলা ভূমি। ভারতসভ্যতার বহু বিচিত্র রূপ তার বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে আছে, আজও। তার শৌর্যবীর্য-গাথা, নারীদের সতীত্ব রক্ষার কাহিনি—সবই ছিল সম্পদ। কত স্থানে ইতিহাসের পদচিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে বৈদেশিক আক্রমণে। কত আকাশচুম্বী মন্দিরচূড়া মাটিতে মিশেছে, কত প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত, বৌদ্ধযুগের মহাবিদ্যালয় নালন্দা প্রভৃতি হয়েছে জঙ্গলাকীর্ণ। খননের অপেক্ষায় রয়েছে আরও কত পুরাকীর্তি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত পরিক্রমার সময়ে এই ভারতের অনুপুঙ্ক্ষ পাঠ নিয়েছিলেন। তাই বলা হয় তিনিই যেন পরিণত হয়েছিলেন ঘনীভূত ভারতবর্ষে। ভারতের এই সন্তানের মধ্যেই ভগিনীর ভারতদর্শন নতুন মাত্রা পায়।

সেই গভীর গম্ভীর ভাবঘন বিশালতার মূল্যায়ন সহজ নয়। বিরাট পুরুষের পশ্চাৎপট রচনায় নিবেদিতার লেখনী যেন শতধারে উৎসারিত। শুধু মননের কালিতে নয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবের টানাপোড়েনে দীর্ণ রক্তাক্ত হৃদয়খানিই যেন তুলে ধরেছিলেন তিনি গ্রন্থরচনার আবর্তে। তাই সে-রচনা পেয়েছিল নতুন সুর। সেখানে আধ্যাত্মিক ভাবের অবিরাম আলোড়ন পাঠকের চিত্তাকর্ষী হয়েছিল।

ভগিনীর নিবেদন ছিল সর্বাত্মক—দেহপ্রাণমন আত্মার আলোকে প্রজ্বলিত করে, ভারতের দহনজ্বালাকে অন্তরে গ্রহণ করে তিনি নিজেকে

পরিণত করেছিলেন শিখায়। সেই শিখা সহস্ররূপে জ্বলে উঠেছিল স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক তিরোধানের পর। স্বামীজী একবার গুরুভাইদের বলেছিলেন : ''এরপর নিবেদিতার কার্যকরী শক্তি দেখবি।...'' শ্রীগুরুর মুখের কথা নিবেদিতার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। তাঁর আত্মদানের নৈবেদ্য এককথায় ছিল নজিরহীন। যারা শুধু গ্রহণেই উন্মুখ, তাদের কল্পনারও অগোচর ছিল এই মহান আত্মনিবেদনের মহিমা। তাঁর মতো গ্রহীষ্ণু মন নিয়ে ভারতকে ভালবেসেছেন কজন বিদেশি! কালিদাসের কথায় সূর্যের রসগ্রহণের উপমাটি মনে পড়ে। 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম্ আদত্তে হি রসং রবিঃ'—সূর্য সহস্রগুণ রসদানের জন্যই রস গ্রহণ করে। তারপর সহস্রধারায় ধরিত্রীকে সিক্ত, সুফলা করে তোলে। নিবেদিতা স্বামীজীর ভারতভাবনা অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছিলেন, যে-সৌভাগ্য অন্য কারও হয়নি। স্বয়ং স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন : ''...ও বিদেশি মেয়ে, সব ছেড়ে ছুড়ে আমার কাছে এসেছে... বেশ ভাল মেয়ে, খুব সমঝদার। এর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই।'' এই সমঝদার কন্যাটি ভারতের মর্মকথা কত গভীরভাবে জেনেছিলেন এবং জীবনে অনুশীলন করেছিলেন তার পরিচয় ভারতের তৎকালের মনীষিবৃন্দের বিস্মিত স্মৃতিচারণায় ধরা আছে।

তখনকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, কবি, শিল্পী, স্থপতি নত হয়েছিলেন ভগিনীর উৎসর্গের আবেদনে। যাঁর স্থান হতে পারত বিদ্বৎসভার শীর্ষদেশে তিনি বাগবাজারের এঁদো গলির বাসিন্দা হয়ে মেয়েদের জন্য একটি ছোট্ট স্কুল খুলে বসলেন। জগজ্জননী সেইখানেই তাঁর আশীর্বাদের ঝাঁপি উপুড় করে দিলেন, স্বামীজী দুই গুরুভাইকে নিয়ে সেই শুভারম্ভকে স্বাগত জানালেন।

নিবেদিতার দানে কোনও গরিমা প্রকাশ পায়নি। মহাদানের যে-উপাখ্যানগুলি বুদ্ধচরিত্রকে উজ্জ্বল করেছিল, গুরুর আশিসে নিবেদিতার মধ্যে সেই নিঃশেষ আত্মদানই রূপ নিয়ে 'নিবেদিতা' নামটি সার্থক করে তোলে। যিনি বুদ্ধত্বলাভের আগে পাঁচশো বার পরের জন্য জীবন দান করেন ''সেই বুদ্ধকে অনুসরণ করো''—এই অভূতপূর্ব আত্মদানের প্রেরণা নিয়েই নবজীবনের শুরু হল। স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নি-প্রেরণা গ্রহণের অর্থই অবিরাম অনলে দগ্ধ হওয়া। দহনের মধ্যেই আত্মনিবেদন।

ভগিনীর কথাপ্রসঙ্গে দীর্ঘ ভূমিকা তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের বর্ণময় চালচিত্র। স্বামীজীর আহ্বান শতসহস্র প্রাণকে জাগিয়েছিল কিন্তু ''হে মহাপ্রাণ ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?''—বলে পত্র-আহ্বান একজনের কাছেই এসেছিল—তিনি ছিলেন নারী। লন্ডনের সুখ্যাত সিসেম ক্লাবের সেক্রেটারি, অতিশিক্ষিত, শিল্প-সংস্কৃতির শিখরে আধুনিক মননঋদ্ধ এক অসীম তেজস্বিনী।

পরাধীন ভারতে তিনি যেন উৎক্ষিপ্ত হলেন নবজাগ্রত ইউরোপ থেকে। স্বামীজীর আমেরিকায় পদার্পণ সম্বন্ধে তিনি যে-বর্ণনা দিয়েছেন স্বামীজীর রচনাবলির ভূমিকায়—তারই বিপরীত চিত্র তাঁর জীবনে। তাঁর কাব্যিক বর্ণনায়—সেখানে জীবন সৃজনশীল, চিত্তসাগর তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল, মন অনুসন্ধিৎসু ও সজাগ। অন্যদিকে স্বামীজী ছিলেন এক সুপ্রাচীন জগতের অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত ভূখণ্ডের প্রতিভূ। সেই প্রাচীন সভ্যতার প্রথম পাঠ তিনি নিলেন স্বামীজীর কাছে। দ্বিতীয় পাঠ কলকাতা মহানগরীর নগণ্য গলি, বাগবাজারের পথে প্রান্তে, গঙ্গার তীরে, হিন্দুনারীর গৃহস্থালিতে ও গ্রাম্য পরিবেশে।

বাগবাজার তখন শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি শ্রীমায়ের বাসস্থান, ভক্তদের যাতায়াতে মুখর, সাধুসন্তানদের আশ্রয়। অন্দরমহল, বাহিরমহল যুক্ত হয়ে

শ্রীমায়ের চারদিকে বৃত্ত রচনা করেছে। সেখানে স্বামীজী নিয়ে এলেন তিন বিদেশিনী ভক্তকে যাঁরা স্বামীজীকে দেখে ও তাঁর মুখে ভারতের কথা শুনে এই পরাধীন দেশে এসেছেন। শ্রীমায়ের কাছে তাঁরা পেলেন স্নেহের ছাড়পত্র। পরে নিবেদিতা মায়ের অন্দরমহলেও থাকার অধিকার পেলেন যা তখনকার সমাজে কল্পনার বাইরে। ক্রমে ক্রমে সমাজের নিয়ম ও মাতাঠাকুরানির অসুবিধা বুঝে বুদ্ধিমতী নিবেদিতা বাসস্থান পরিবর্তন করেন ১৬ নং বোসপাড়া লেনে।

স্বল্পসময়ের মধ্যেই তিনি পরিচয় পেলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের। সেখানে অন্তঃপুরিকারা পর্দার আড়ালে থেকেও নিয়ন্ত্রণ করেন নিজেদের ঘর-সংসার। স্বামীজী যেদিন বলরাম মন্দিরে মিশনের সভায় নিবেদিতার সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য পুরুষভক্তদের কাছে তাঁদের কন্যাদের চাইলেন, সেদিনও তাঁদের মনে একরাশ বাধা। সে-বাধা সমাজের এবং পরিবার থেকেও।

যিনি অন্দরমহলের জানালাগুলি খুলে শিক্ষার আলোক আনতে চাইলেন, তাঁর সামনেই হিন্দুসমাজ সেগুলি আবার বন্ধ করে অন্ধকারকে ডেকে আনার প্রয়াস করেছিল। এই বাধা-বিপত্তির প্রাচীর ভাঙতে সেদিন ভগিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে আক্ষরিকভাবে নম্র নত হয়ে কর্তাব্যক্তিদের কাছে কন্যা ভিক্ষা করেছিলেন। লন্ডনের উচ্চশিক্ষিত, অতি-আধুনিক কন্যাটি যে পদে পদে কী অসাধ্য সাধন করেছিলেন, বাগবাজারের গলির বাসিন্দাদের সেই তপস্যা বোঝার শক্তি ছিল না। বরং তাঁর সেই নিবেদনকে অনুভব করেছিলেন বাংলার মনীষিবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলে তা অনুধাবন করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছিলেন। মানবিক ভাষায় সেই দেবীর একান্ত আত্মদানকে প্রকাশ করা কঠিন।

নিবেদিতার সেই মহিমা স্বামীজীর চোখ এড়ায়নি। তিনি নিবেদিতার আগামী ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : ''নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ। তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশ কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র। জানবি, এর কথা শুনে সবার তাক লেগে যাবে। নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি।''

স্বামীজীর এহেন উচ্চ প্রশংসাবাক্য আর কোনও ক্ষেত্রেই বর্ষিত হয়নি। তাঁর বাক্য ছিল সত্যঋদ্ধ, ভাবী কালের নির্ভুল চিত্র—যার পরিচয় ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল বিংশ শতকে নবজাগরণের প্রতিভূদের সামনে। বলতে গেলে বাংলার রেনেসাঁসকে অন্তরাল থেকে প্রেরণা দিয়েছিলেন ভগিনী স্বয়ং। সেই কারণে তিনি নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আশ্রয় রামকৃষ্ণ মিশনকে পর্যন্ত পরিহার করলেন কাগজে-কলমে। স্বামীজী-পরিকল্পিত মঠ-মিশন ও তার কর্ণধারগণের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ কোনও কালেই ছিন্ন হয়নি। বরং তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষের জন্য তাঁর উদ্যোগে তাঁদের সাদর ও নীরব সমর্থন। তা নইলে স্বামীজীর বাক্য বিফল হয়ে যেত। তাঁর ঘোষণা ছিল—সমগ্র ভারত নিবেদিতার ভাবে মুখর হয়ে উঠবে—'India shall ring with her'। স্বামীজীর দূরদৃষ্টির সামনে নিবেদিতার জীবন ছিল খোলা পাতার মতন। তাই সে-জীবনের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন অভ্রান্ত রেখায়। সুতরাং তাঁর নিবেদন যে কী মাত্রায় মহৎ থেকে মহত্তর রূপ নিয়েছিল তা পরিমাপ করা সেকালের চিন্তাবিদদের পক্ষেও সহজ ছিল না।

স্বামীজীর পুণ্য সাহচর্যে নিবেদিতা যত আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হন, ততই ভারতকে ঘিরে তাঁর প্রজ্ঞা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। শুধু বৈদিক সভ্যতা নয়, ইতিহাসের পথ বেয়ে যে-ভাবধারা ভারতের প্রাণকে সঞ্জীবিত ও স্থির নিষ্কম্প রেখেছিল ভগিনী সেই প্রবাহে সুস্নাত ও স্নিগ্ধ হলেন। তাঁর চোখে নতুন আলো জ্বলল। নতুন

চমৎকারিত্ব দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রদ্ধাবনত হলেন ভারতমাতৃকার চরণে। 'খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি' এই ভারতের মাটি, যেখানে যুগে যুগে নানাভাবে অবতাররূপী দিব্য পুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন। যে-দেশের কবি-সাহিত্যিক খাগের কলমে লিখেছেন সোনার মতন উজ্জ্বল চিরকালের অমরকথা, শিল্পে ফুটেছে সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার সঙ্গে মহৎ জীবনের অপূর্ব আলেখ্য, সংস্কৃতিতে ধরা আছে বেদ-বেদান্তের উত্তুঙ্গ শিখর, 'সত্য জ্ঞান ও আনন্দ' ত্রিবেণীর বিপুল বিচিত্র প্রবাহ, ত্যাগের গৈরিকধারায় যেখানে সাধককুল অভিষিক্ত হয়ে জনগণের সামনে স্থাপন করেছেন ত্যাগ ও সেবার যুগ্ম আদর্শ—এ সেই পবিত্র পুণ্যভূমি। নিবেদিতা বাগবাজারে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় পেলেন তারই পরিচয়। খেলার পুতুলগুলি তাঁকে প্রাচীনতর আর এক সভ্যতার শৈশব মনে করাল। গৃহবধূ ও স্নানের পথে মানুষকে বট বা অশ্বত্থমূলে পাথরের মাথায় জল ঢালতে দেখে তিনি বড় আনন্দিত। এঁদের জীবনে ধর্মাচরণ বড় অন্তরঙ্গ বস্তু। ঘরে ঘরে গৃহদেবতার অর্চনা, সন্ধ্যায় দিনের শেষে শঙ্খধ্বনি, রাতের নৈঃশব্দ্য—সবের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন হারিয়ে যাওয়া এক আশ্চর্য ধর্মীয় আবহ। সেইসঙ্গে চোখে পড়ল কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব। জানার বা বোঝার আগেই বিধবা বালিকাদের কচিকচি মুখ, তাদের কঠোর জীবনযাত্রা এবং ছাত্রীদের অল্পবয়সে বিবাহ যেন সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছিল। এদের শিক্ষার জন্যই তো একটা শিক্ষায়তন খোলা হল। আপাতদৃষ্টিতে তাই ছিল প্রথমদিকের শুরুটা। শেষটা কী হবে তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন স্বামীজী স্বয়ং, যার সার কথা—''মার্গট, পাশ্চাত্য মানুষদের কাছে বোলো না, তুমি A. B. C. D. শেখাবার জন্য স্কুল খুলেছ। বোলো যে তুমি প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা দিতে চাইছ।" ভগিনীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নারীশিক্ষা অনুসরণ করবে প্রাচ্য ভাবধারার আদর্শ—এই ছিল তাঁদের অভিলাষ। আর আশ্চর্যের কথা, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কর্মী ও শিক্ষিকারাই ধীরে ধীরে স্বামীজী-পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হন, যদিও তার জন্য অর্ধশতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়।

চালচিত্র রচনা না করে নিবেদিতাকে উপস্থাপনা করা যায় না। বস্তুত সে-চালচিত্রে দশমহাবিদ্যার মতোই বিচিত্র শক্তির খেলা। তার থই পাওয়া যায় না দু-চার কথায়। তবে প্রথমে যেকথা নানা সুরে বলা হয়েছে সেই আত্মদানের প্রস্তুতি, তার কার্যকরী রূপ ও পরিণতি—সব মিলিয়েই তাঁর জীবনবেদিতে প্রজ্বলিত হয়েছিল আত্মাহুতির অনল।

আজ সার্ধশতবর্ষের দূরত্বে বসে আমাদের মনে হতে পারে তাঁর ভাবাবেগ, মহান উৎসর্গ কি সেদিনের সমাজে কোনও পরিবর্তন এনেছিল? আমরা সেকালের বহু মানুষের স্মৃতিচারণেই ভগিনীর অদ্ভুত প্রেরণা, তাঁর নিঃশব্দ সহায়তার প্রসঙ্গ শুনি। তাঁদের অনেকেরই মনে হত তিনি যেন রক্তমাংসের মানবীমূর্তি নন, তাঁর আগাগোড়াই ভাব দিয়ে গড়া—তিনি ভাবময়ী, উৎসাহ ও প্রেরণার দূতী। তিনি শ্বেতবসনা সরস্বতীর মতন মালিন্যহীন এক মহাশ্বেতা। প্রজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বল সত্তা। তাঁকে এযুগেও আমাদের চাই। তিনি যে তাঁর প্রচণ্ড কর্মের সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে হয়েছিলেন বিবেক-তনয়া! তাঁর কর্মের অন্তরালে থাকত ধ্যান। তিনি একসময় তাঁর ডায়েরির পাতায় লিখেছিলেন—আত্মা ও দেহ যে আলাদা তা আজ অনুভব করলাম। এযুগের মেয়েরা কি সে-অবস্থা লাভ করেছেন? তাই তিনি অদ্ভুত কর্মময় জীবনযাপন করেও আমাদের আদর্শ—প্রাচীন প্রজ্ঞার প্রতিনিধি ও পাশ্চাত্যের কর্মময়তার বিপুল প্রকাশ।